



# নারী কেনো শুধুই নারী

রাহনুমা রাখী

“নারী সম্মত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত প্রাণী”- কথাটি ভার্জিনিয়া উলফের। হাজারো শতক ধরে তর্কে বিতর্কে নারী যতটা স্থান জুড়ে রয়েছে অন্য কোন প্রাণী ততটা নয়। কেনোনো নারী একটি পরাজিত সন্তা। যে ফিরে পায়নি তার যোগ্যতম অবস্থান। ফিরে পায়নি এখনও তার ঘর।

নারী কী? বাংলা অভিধান ঘাঁটলে নারীর যে সমার্থক খুঁজে পাওয়া যায়-স্ত্রী, রমণী, ললনা, অঙ্গনা, কামিনী, বনিতা, মহিলা, বামা, নিতম্বিনী, সুন্দরী প্রভৃতি। নারী সুন্দর তাই সে রমণী, সুন্দরী। নারী কামনা জাগায় তাই সে কামিনী, নিতম্বিনী। গরু থাকে গোয়ালে, মুরগি থাকে খামারে ঠিক তেমনি নারী থাকে মহলে তাই সে মহিলা। নারী মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, সেবাদাসী। নারী ন্যূন ত্বর, শরৎ-এর উপন্যাসের নায়িকার মতো বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। নারী স্ত্রী হয়ে একজন পুরুষের অধীনে বসবাস করে, ঘর গৃহস্থালী নিয়ে সময় কাটায়, প্রসব করবে মনুষ্য সন্তান।

সমাজে এ-ই নারীর সংজ্ঞা!

মনুষ্য প্রজাতির দুটি সন্তা- নারী ও পুরুষ। একই রকম ২২ জোড়া অটোসোম নিয়ে ও এক জোড়া ভিন্ন সেক্স ক্রোমোসোম নিয়ে জন্ম নেয় মানুষ নামক প্রাণী। সেক্স ক্রোমোসোম আবার দুই প্রকার X ক্রোমোসোম ও Y ক্রোমোসোম। নারীর ক্ষেত্রে এই ক্রোমোসোমের বিন্যাস থাকে XX ও পুরুষের ক্ষেত্রে XY। শুধুমাত্র একটি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোম X অথবা Y এর পার্থক্যের দরঘনই কি একটি পুরুষ হয়ে উঠে প্রভু ও নারী হয়ে উঠে দাসী? না। আমাদের সমাজে নারী পুরুষের যে পার্থক্য দৃশ্যমান তা যতটুকু না প্রাকৃতিক কিংবা

বৈজ্ঞানিক তার চেয়ে অনেক বেশি ঐতিহাসিক ও সামাজিক।

নারী সম্পর্কে ঠিক এই কথাটিই বলতে চেয়েছেন সিমোন দ্য বোভোয়ার-“কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং হয়ে উঠে নারী”।

আর নারী তৈরি করার এই প্রক্রিয়া শুরু হয় সেই ছোটকাল থেকে।

একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে এই প্রথিবীকে চিনতে শিখে তার চোখ দিয়ে, অনুভব করতে শিখে তার হাত দিয়ে, বুৰাতে শিখে তার মন দিয়ে। আর আমাদের কিছু সামাজিক অবকাঠামো যা নির্ধারণ করে নীতি, নিয়ম, প্রথা, তা ধীরে ধীরে বদলে দিতে থাকে শিশুর মন ও করে তুলে তাদেরই মতো করে। খেলার উপকরণ হিসেবে সবার প্রথম আমরা একটা শিশুর হাতে কী তুলে দেই? ছেলে শিশুর হাতে বন্দুক, পিস্তল, স্পোর্টস কার, বল, ব্যাট। এই খেলনাগুলো তার ভিতর বোধ জন্মায় ক্ষমতার, দাপটের, প্রতিযোগিতার। সে সিনেমার নায়কের মতো অভিনয় করে খেলনা বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেয় ভিলেনদের। সে কল্পনা করে ক্রিকেটারের মতো ঝাঁপ দিয়ে লুকে নিচে ক্যাচ। আর একটি মেয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুতুল, পুতুলের ঘর, বিছানা, হাড়ি পাতিল। মেয়েটি পুতুলকে সাজায়, সন্তানের মতো আদর করে, তার বিয়ে দেয়, হাড়ি পাতিল দিয়ে সে রান্না করে। এভাবেই একটি ছেলে তৈরি হয় ভবিষ্যতের প্রথিবীতে সংঘর্ষ করে বেঁচে থাকতে, আর মেয়েটি সংসারের একঘেয়ে চার দেয়ালের ভিতর প্রতিদিন একই কাজের পুনরাবৃত্তি ও সন্তান লালন পালন করে জীবন কাটিয়ে দিতে।

সোনার কাঠি রংপোর কাঠি, সিঙ্গেলা, ঘুমত সুন্দরী রাজকুমারীদের কাহিনী কে না শুনেছেন! ছোটকালে এইসব রূপকথাই তো শুনে আমরা বড় হই। ডাইনির অভিশাপে রাজকুমারী ঘুমিয়ে থাকে রাজার সামাজে বন্দী হয়ে। রাজকুমার ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, সকল বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যায় রাজকুমারীকে।

কিংবা দয়ালু রাজার কাহিনী- রাজ্য ভ্রমণ করতে বেরিয়ে এসে এক সৎ মেয়ের সন্ধান পেয়ে তিনি পুরক্ষার স্বরূপ তাকে তার ছেলের পুত্রবধূ করে বরণ করেন। এইসব রূপকথা, শিশুতোষ গল্পের পুরো পাতা ধরে থাকে প্রায় একই কাহিনী। রাজকুমারী অপেক্ষায় থাকে রাজকুমারের, কবে এসে তাকে জয় করে নিয়ে যাবে তার সাথে। একটি ছেলের সাহসিকতায় যেখানে তাকে পুরক্ষার দেওয়া হয় রাজার অর্ধেক রাজ্য ও সবচেয়ে আদরের কল্যাণি সেখানে একটি মেয়ের সাহসিকতায় কিংবা সততায় থাকে তাকে পুত্রবধূ করে নেয়ার পুরক্ষার। শৈশবের এইসব কথা, গল্পাই একটি মেয়ে শিশুর মনে স্পন্দ জাগায়

নিজেকে সাজাতে, সুন্দর করে তুলতে। নিজেকে সে বারবার আয়নায় দেখে। মাকে দেখে অনুকরণ করার চেষ্টা চালায়। কপালে টিপ পড়তে ভালোবাসে। শাড়ি গয়না নিয়ে নাড়াচাড়া করে। দাদির কাছে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোয় ও স্বপ্ন দেখে একদিন তার জীবনেও আসবে এক রাজকুমার। সে তার নিয়তি সেই অজানা পুরুষের কাছে সঁপে দেওয়ার জাল বুনতে থাকে একটি একটি করে।

শিশু থেকে যখন বালিকা হয়ে উঠে মেয়ে। আস্তে আস্তে তার বাইরের জগত ছেট হতে থাকে। খেলা-ধূলার মাঠ, দোড়-ঝাঁপা, পার্ক-উদ্যান তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। ঘরের ভিতর সে শিখতে থাকে সেলাই, রান্না-বান্না, অতিথি আসলে আপ্যায়ন, ঘর-গৃহাঞ্চলীর কাজ। যা তার নিয়তি- সেই নিয়তি সমাজ যা নির্ধারণ করে রাখে একটি মেয়ের জন্য।

বয়ঃসন্ধিকালে ঝাতুসাবের পর থেকে একটি মেয়ের জীবন আরো বেশি জাটিল হয়ে পড়ে। সেই প্রথম শারীরিকভাবে সে নারী হয়ে উঠতে থাকে। ঝাতুসাবের সময় তলপেটে ব্যথা, ভারী ভারী লাগা, উঠতি বুকে সামান্য ঝাঁকুনিতে ব্যথা করা যা শরীর সম্পর্কে তাকে বিরক্ত করে তুলে। নিজের শারীরিক গঠন নিজের কাছে অস্পষ্টিকর হয়ে পরে। এই অবস্থাটি প্রশংসিত হতে পারত যদি তাকে খেলতে দেওয়া হত, সাঁতার কাটতে দেওয়া হত, শারীরবৃত্তিক চর্চা করতে দেওয়া হত। তাহলে সে কাটিয়ে উঠতে পারত এই অস্পষ্টিকর পরিস্থিতি। স্বতঃক্ষুর্ত হতে পারত চলাফেরায়, নিয়ন্ত্রণ করা শিখে নিত নিজের শরীরকে। তা না করে আমরা করি তার উল্লে। সবার আগে আমরা তার পৃথিবীটাকে করে তুলি ছেট। তার চলাফেরার পথে আরোপ করি নানা বিধিনিষেধ। ঝাতুসাব যেনো এক শারীরিক ব্যাধি। মা সঙ্গাপনে জানিয়ে দেয় এ নিষিদ্ধ কিছু। লুকিয়ে লুকিয়ে প্যাড বদলানো হয়। অন্য কারো সামনে এই ব্যাপারে কোন কথা উঠানো যায় না। কথা উঠলে নিজেকে লজিত হতে হয় যারা শুনে তারাও লজিত হয়। দোকান থেকে ন্যাপকিন কিনে আনতে গেলে ব্রাউন পেপারে মুড়িয়ে নেয়া হয় যেনো অবৈধ, লজ্জাকর, নিষিদ্ধ কোন ষড়যন্ত্র চলছে নিজের দেহ নিয়ে। অর্থ তার ভাইয়ের মুসলমানিতে পাড়া-সুন্দ লোকদের ডেকে খাওয়ানো হয়। ভাইয়ের জননাঙ্গ তখন নিষিদ্ধ হয় না। বরং তার শিশু হয়ে উঠে আদরের বস্তু। আদর করে তার নাম দেওয়া হয় সোনা, ধন। অপরদিকে মেয়েটির জননাঙ্গ সবসময়ই নিষিদ্ধ। তাকে জননতে দেওয়া হয় না, নাড়াচাড়া করতে দেওয়া হয় না জননাঙ্গ নিয়ে। বিয়ের পরে অনেকবার সঙ্গে যাওয়ার পরও নারী জননতে পারে না তার যৌনী, ভগান্ধারের সঠিক কাজ। যে দেহটি সে বয়ে বেড়ায় আজীবন, তা নিয়ে সে অঙ্গই থাকে, জননতে পারে না কখনই তার ভিতর কি খনি লুকিয়ে আছে। তার বুকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ওড়া। বুক থেকে ওড়না সামান্য খসলেই যেন মহাভারত অঙ্গন হয়ে যায়। বাসে, ট্রেনে, ফুটপাতে এমনকি

সেই প্রথম শারীরিকভাবে সে নারী হয়ে উঠতে থাকে। ঝাতুসাবের সময় তলপেটে ব্যথা, ভারী ভারী লাগা, উঠতি বুকে সামান্য ঝাঁকুনিতে ব্যথা করা যা শরীর সম্পর্কে তাকে বিরক্ত করে তুলে। নিজের শারীরিক গঠন নিজের কাছে অস্পষ্টিকর হয়ে পরে। এই অবস্থাটি প্রশংসিত হতে পারত যদি তাকে খেলতে দেওয়া হত, সাঁতার কাটতে দেওয়া হত, শারীরবৃত্তিক চর্চা করতে দেওয়া হত।

নিজের ঘরে বাবা- ভাইদের সামনে খুব সাবধানে নিজেকে কাপড় দিয়ে মুড়ে চলতে হয়। শরীরের কোন উঁচু অংশ যেন ভুলেও না দেখা যায়। এত কিছুর পরেও সে পারে না যৌন হয়রানি থামাতে, পারে না ধর্ষণ থামাতে। এমনকি ঘরের মানুষ যাদের সে আপন ভেবে বেড়ে উঠেছে তাদের চোখেও সে দেখে কামুক দৃষ্টি। তার মানে পুরুষের কাছে সে নিতান্তই যৌন বস্তু! তার শরীরই তার শত্রু হয়ে উঠে। সে দোড়তে পারে না, বাসে উঠে ছেলেদের মত ঝুলতে পারে না, দোড়ে এসে টেন ধরতে পারে না। রাত বারোটার দিকেও তার ভাই ঘরে ফিরে, কিন্তু সে নিজে ফিরতে পারে না। রাত হওয়ার সাথে সাথেই খোয়ারের মুরগির মতো তাকে ঘরে ঢুকে বসে থাকতে হয়। সিগারেট ফুকা, বন্দুদের সাথে যেখানে সেখানে ঘুরতে যাওয়া একটি ছেলের জন্য যা নিতান্তই স্বাভাবিক তার জন্য তা অস্বাভাবিক- এই ভাবনাই তাকে হতাশ করে তুলে নিজের ব্যাপারে। মেয়েটি যদি উঠতে চায় তবে লোকে তাকে বেহায়া বলে গালি দেয়। সে যদি সিগারেট ফুকতে চায় কিংবা ছেলেদের মতো স্বতঃক্ষুর্ত পোশাক পরতে চায় তবে লোকেরা তার দিকে ভু কুঁচকে তাকায়। এই সবই নারীকে বুবাতে শিখায় সমাজের কাছে সে নিতান্তই একটি জড়বস্তু। একটি অক্ষিয় বস্তু। ছেট ছেট এইসব আনন্দ তার জন্য নয়। তার নিজস্ব কোন ইচ্ছে থাকতে নেই। তার আছে শুধু একটি শরীর যা দিয়ে সে তুষ্ট করবে পুরুষদের, সত্তান জন্ম দিয়ে রক্ষা করবে বংশ।

জিহোভার ভাষ্য-'Anatomy is her destiny'। শরীরই তার নিয়তি।

মেয়েদের আড়তায় তাই ঘুরেফিরে এই বিষয়গুলোই চলে আসে। কার কবে বিয়ে হল, কে কোন গহনা কিনল, নতুন ফ্যাশনের পোশাক পড়ল, কার স্বামী কেমন। কোন খেলোয়াড় কত সুন্দর, কোন নায়ক কত আকর্ষণীয়। সে খেলোয়াড়দের পছন্দ করে তার খেলা দেখে নয়, তরুণ রাজনীতিবিদের পছন্দ করে তার রাজনীতি দেখে নয়। খেলোয়াড়, গায়ক, নায়ক, রাজনীতিবিদ সর্বত্র সে খাঁজে তার স্বপ্নের রাজকুমার। সে স্বপ্ন দেখে তাদের সাথে রোমান্স করার, ঘুরে বেড়ানোর, বিয়ে করার, তাদের সন্তানের মা হওয়ার। যদিও সে জানে তা সে কখনোই পারবে না তবুও সে স্বপ্ন দেখে, কারণ এছাড়া সে আর কিছুই শেখেনি। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আমার সহপাঠীদের মাঝেও দেখেছি জীবন সম্পর্কে এক অদ্ভুত অবসাদ। ছেলেরা চিন্তা করে কতদিনে পাশ করে চাকরি নিবে। আর মেয়েরা ভাবলেশহীন। ছেলেদেরকে আমি প্রায়ই বলতে শুনি, ‘তোমাদের কী! তোমরা তো ছেলে দেখে কারো গলায় ঝুলে যাবে’। আর মেয়েরাও সেই কথায় তাল দিয়ে সমর্থন যুগিয়ে যায়। ভারী ভারী যেকোন কাজ তারা ছেলেদের উপর সঁপে দিয়ে বলে- ‘আমরা তো মেয়ে! আমরা তো এ করতে পারি না!’ কিছু কিছু মেয়ে যদি ভাঙতে চায় এই প্রথা, করতে চায় গঠনমূলক কোন কাজ, তবে তাকে কাজ করতে হয় ছেলেদের সাথেই। আর তখনই তাদের নামে শুরু হয় মুখরোচক কাহিনী। একা একটি মেয়ে দশ বারোটা ছেলের সাথে বসে চা পান করছে, সিগারেট ঝুঁকছে পায়ের উপর পা তুলে, আড়ত মারছে। নিশ্চয়ই মেয়েটার কিছু সমস্যা আছে। মেয়েটা আসলে বেশ্যা! অর্থাৎ তুমি অবলা রামণী তা-ই হয়েই থাকো। সুন্দর করে সাজো, নিতৃষ্ণ কোমর দুলিয়ে হাঁটো। ছেলেদের আকৃষ্ট কর। একসময় বিয়ে করে কোন এক ছেলের গলায় ঝুলে পড়। বিপুলী, প্রতিবাদী হয়ো না। ভাঙতে যেও না তোমার সামনের দেয়ালটি।

বিজ্ঞাপন সংস্থায় বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন থাকে শুধু নারীর সাজ উপকরণ নিয়ে। সাবান, পাউডার, রূপচর্চার ভেষজ উপকরণ, নেইলপালিশ, লিপস্টিক, বিভিন্ন আকৃতির ত্রুটা যা নারীর বুকের মাপকে করবে আকর্ষণীয় প্রভৃতি। বিজ্ঞাপনের কাহিনীগুলোও প্রতিফলিত করে সমাজে নারীর সঠিক অবস্থানটি। টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবে মেয়ে। সব প্রস্তুতি নেওয়া শেষ। আর মাত্র কয়দিন বাকি। তখনই সে খেয়াল করল তার চেহারার রঙের চেয়ে গায়ের রঙ অনুজ্জ্বল। এলো সমাধান নতুন এক ক্রিম। সেই ক্রিমের দরজন মেয়েটি হয়ে উঠল সুন্দর আর জিতে নিয়ে এলো ট্রফি!

সাইকেলের রেসে অংশগ্রহণ করে মাকে একটি বাড়ি উপহার দিতে পারবে না ঠিকই জানে মেয়ে। তাই শুরু হয় লোশন

মাথামাথি। সাইকেল রেস জিতার দিন এক ফটেগ্রাফার তাকে দেয় কাঞ্চিত সুযোগ- ব্র্যান্ড অ্যাস্যাডার হওয়ার। এভাবেই পূরণ করে সে তার স্বপ্ন।

সাংবাদিকতার কাজে প্রতিদিন ঘুরতে হয় অলিগলি। পুড়তে হয় রোদে। তাই গায়ের চামড়া হয়ে পড়ে কালো। চিন্তা নেই আপনার জন্য আছে সানক্রিন লোশন। পরের দিনই প্রেস কনফারেন্সে সাক্ষাৎ দিতে আসা ব্যক্তিটি সাংবাদিকদের ভিড় থেকে সেই মেয়েটিকেই সামনে এগিয়ে আসার অনুরোধ করে আর শুধু তার প্রশ়্নারই উত্তর দেয়।

বয়স ৩০ পেরোনো স্ত্রী চোখের পাশে ভাঁজ, অম্বৃগ চামড়া নিয়ে বড়ই ব্রিত। স্বামী তাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না। এইজ মিরাকল ক্রিম ব্যবহার করে সে ফিরে পেয়েছে তার আগের ঘোবন, ধূমে রেখেছে তার তারঢ়ণ্য। স্বামীর প্রেম তাই আবারও জেগে উঠে। স্ত্রীকে ভালোবাসতে এখন আর স্বামী কার্পণ্য করে না!

এই হল বর্তমানের বহুল প্রচলিত বিজ্ঞাপনের কাহিনী, যেগুলো বারেবারে নির্দেশ করে নারী তুমি যেই ক্ষেত্রেই বিচরণ কর, তুমি খেলোয়াড় হও কিংবা সাংবাদিক নয়ত গার্লিকা তোমাকে হতে হবে সুন্দর। একটি ছেলের যোগ্যতার মাপকাঠি যেখানে তার প্রতিভা, তোমার যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি তোমার রূপ। কারণ তুমি একটা দেখার বস্তু! দুচোখ দিয়ে গেলার বস্তু! তাই তো গাড়ির শোরুমে নতুন গাড়ির উদ্ঘোষণে দু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে দুইজন সুন্দরী। এমনকি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা শুরুর আগেও কাপ প্রদর্শনের সময় বিশ্বকাপের দুইপাশে দুইজন নারী শোভা পায়। বাণিজ্যিক ক্রিকেট টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটে চিয়ারলিভারদের রমরমা ব্যবসা। মাঠে পুরুষেরা ব্যাট বল নিয়ে যুদ্ধ করে আর পিছনে চিয়ারলিভারেরা নেচে-গেয়ে খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা দান ও দর্শকদের মনোরঞ্জনে থাকে ব্যস্ত। প্রবাদে আছে- ‘প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে থাকে একজন নারীর হাত’। এখানেও নারীর কাজ সেবামূলক। পুরুষ প্রতিযোগিতায় নামবে, পরিশেম করে ঘর ভর্তি করবে সাফল্যের কীর্তি দিয়ে। আর নারী তুমি পিছনে থেকে তাকে যুগিয়ে যাবে অনুপ্রেরণ। মধ্যের পদার্থ পিছনেই তোমার অবস্থান। মধ্যে তোমার আবির্ভাব কখনই হবে না। তুমি নিজে সফল কখনই হবে না। তুমি শুধু পুরুষকে করে তুলবে সফল, কর্মেন্দুষ্ম। সমাজ নারীর কাছে তাই প্রত্যাশা করে।

নারীর শিক্ষা-পদ্ধতিও থাকে ভিন্ন। মাধ্যমিক লেভেলে তাকে দেওয়া হয় গার্হস্থ্য অর্থনৈতি নামক একটি বিষয় যেখানে সুচারু বর্ণনা থাকে আদর্শ গৃহিণীর করণীয় সম্পর্কে। বিদ্যালয় পর্যায়ের, পরিবার পর্যায়ের, সমাজ পর্যায়ের তার সকল শিক্ষা-দীক্ষার একটিই উদ্দেশ্য কীভাবে তাকে বিয়ের উপযুক্ত করে

তোলা যায়। একটি মেয়ের বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা থাকে তার বিয়ের! কতদিনে মেয়ে ১৮ পের্সনে, একটি উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া হবে এই চিন্তাতেই তাদের কপালের ভাঁজ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায় পাত্র খোঁজা। পাত্র হতে হবে শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বাবলম্বী। অপরদিকে একটি মেয়ের কাছে কখনোই এসব আশা করা হয় না। ধরেই নেওয়া হয় নারী এক বিকলাঙ্গ প্রাণী যে কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

যাকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কোন একটি পুরুষের ছায়ায় প্রতিপালিত হতে হবে। হতে পারে সে বাবা, তার স্বামী কিংবা ছেলে। বিয়ের বাজারে সুন্দরী মেয়ে তাই কড়া মূল্যে বিক্রি হয়। এদের পেতে সব ছেলের মা বাবারাই মুখিয়ে থাকে। পাত্রীর ক্ষেত্রে সুন্দর হওয়া থাকে প্রথম শর্ত। এছাড়া মেয়েকে হতে হবে নম, মুরুবীদের সামনে যে চোখ নামিয়ে নিচু স্বরে কথা বলে। তার গায়ের রঙ দেখা হয়, চুলের গোছা মাপা হয়, বুকের মাপ নেওয়া হয়। সুস্বাদু করে পরিবেশন করা হয় পুরুষের সামনে যেন বিছানায় তাকে উপভোগ করতে পারে সুখানুভূতি নিয়ে। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে পার করিয়ে দিতে পারলেই বাবা হাফ হেড়ে বাঁচে। আমাদের মতো সমাজে যেখানে মেয়ে শুধুই একটি বোৰা সেখানে অনেকেই- বিশেষ করে গ্রামে- মেয়ের পরিবার বিয়ের বয়স ১৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও নারাজ! তাই আজও বাল্যবিবাহ সংগীরবে তার বিজয় পতাকা উঠিয়ে চলছে বাংলাদেশে।

আমাদের দেশের তথাকথিত ‘নারীবাদী’গণ যারা নারী অধিকার নিয়ে মিছিল- মিটিং করেন তাদের একটাই উদ্দেশ্য থাকে ধর্মিতা মেয়ে, পতিতা মেয়ে, নির্যাতিত মেয়ে, প্রতিবন্ধী মেয়ে- যেকোনো মেয়ের একটি গতি করা, তাদের একটি বিয়ে দেওয়া। হৃষ্যাদুন আজাদ এদের নিয়ে বলেছিলেন- “বাঙ্গলাদেশ যারা নারীদের কল্যাণ চান, তারা মনে করেন নারীর কল্যাণ শুভবিবাহে, সুবী গৃহে, স্বামীর একটি মাংসল পুতুল হওয়াকেই তারা মনে করেন নারী-জীবনের সার্থকতা। স্বামী যদি ভাত-কাপড় দেয়, তার উপর দেয় লিপস্টিক নখ-পালিশ ইত্যাদি, এবং আর বিয়ে করলেও অনুমতি নিয়ে করে, বা তালাক না দিয়ে চার স্তুকেই দেখে ‘সমান চোখে’ তাহলেই নারীকল্যাণ-পিপাসুরা পরিত্পন্ত, ও তাদের আন্দোলন সফল ভেবে ধন্য বোধ করেন”।

গ্রাম্য সালিশে ধর্মিতা মেয়ের ধর্ষণের একটাই সমাধান- আজীবন তাকে ধর্ষণ করার সুযোগ করে দেওয়া ধর্ষকের সাথে বিয়ে দিয়ে। অর্থাৎ নারীর পরিণতি একটাই- বিয়ে।

এগুলো সমাজের অতি সাধারণ কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু প্রতিবন্ধকতা যা নারীর পথে স্বাভাবিক ভাবেই বয়ে চলছে। পুরুষতাত্ত্বিক সমাজ যেই ব্রহ্ম তৈরি করে দিয়েছে আবদ্ধ করে রাখতে নারীকে, নারী তা আজও পারেনি ভাঙতে। কেননা নারী পারেনি এখনও পূর্ণ শক্তিতে জুলে উঠতে। নারীরা

যতটুকু পেয়েছে তার প্রায় সবই পুরুষের দেওয়া। নারী নিজে কিছুই অর্জন করেনি।

মার্কিন কালো শাদাদের দুর্দশ সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ-এর একটি উক্তি ছিল-“মার্কিন শাদারা কালোদের ঠেলে নামিয়ে দেয় জুতোপালিশকারী বালকদের স্তরে, এবং এ থেকে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে কালোরা জুতো পালিশ করা ছাড়া আর কিছুর উপযুক্ত নয়”।

নারী ও পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ঠিক একই স্তরের। পুরুষদের প্রায়ই যে অপবাদ দিতে শোনা যায় তা হল নারী অক্রিয়, অবলা, অপরিপক্ষ। আসলে পুরুষেরা নিজেরাই নারীকে অবলা বানিয়ে রাখে। তাকে সক্রিয় করে তোলার সকল পথ বন্ধ করে বলে নারী অক্রিয়।

তাই নারীকে আজ বেঁচে উঠতে হবে। প্রতিষ্ঠিত হতে হবে একজন মানুষ হিসেবে। সমাজের পুরুষেরা ভুলে গিয়েছে নারীও মানুষ। তাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। মেরি ওলষ্টোনক্র্যাফট, সিমোন দ্য বোভোয়ার, রোজা লুক্সেমবার্গ, তসলিমা নাসরিন যে পথে লড়ে চলেছেন নারীবাদীদের পক্ষে, মাদাম কুরি, আঙ সান সুচি যে-পথে নারীত্বের শক্তি দেখিয়েছেন সেই পথে এখনও চলার অনেক বাকি আমাদের। “ওই গাঁয়েতে বাবার বাড়ি, শুঙ্গর বাড়ি ওই, তোমার বাড়ি কইগো নারী, তোমার বাড়ি কই”? নারীর আজ সময় নিজের একটি ঘর খুঁজে নেওয়ার।

বাহনুমা রাখী, মুক্তমনা সাইটে নিয়মিত লিখে থাকেন।

